‘বাংলা উপন্যাসে ধর্ম : একটি সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ’

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদের অন্তর্গত পিএইচ.ডি উপাধির জন্য প্রদত্ত গবেষণা সন্দর্ভ

(সারসংক্ষেপ)

গবেষক

মহুয়া ভট্টাচার্য্য

তত্ত্বাবধায়ক

অধ্যাপিকা রুবী সাঁই

সমাজতত্ত্ব বিভাগ, ফ্যাকাল্টি কাউন্সিল অফ আর্টস,

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা – ৭০০০৩২

২০২২

বাংলা উপন্যাসে ধর্মের প্রসঙ্গ : একটি সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

ভূমিকা

বিশ্বায়নের পরবর্তী সময়ে বাংলা উপন্যাসের ঔপন্যাসিকদের সাহিত্য রচনার মধ্যে সামাজিক পটভূমিকায় ধর্মের প্রভাব এবং সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা সমাজ ও ধর্মকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রূপে চিহ্নিত করেছে। মানব সমাজের ইতিহাসে একটি প্রাচীন প্রতিষ্ঠান হিসাবে ধর্মেরস্থান সর্বজনবিদিত। এই বিষয়ে দীর্ঘদিন ধরে বৌদ্ধিক চেতনা সম্পন্ন চিন্তক ঔপন্যাসিকদের উপন্যাস রচনার সারস্বত প্রয়াসে যে সমস্ত উপন্যাস রচিত হয়েছে, তা থেকে ধর্ম ও সমাজের প্রাসঙ্গিকতা সম্পর্কে মানুষের মেধা ও মনন আরো বেশি সুসংস্কৃত ও সুউন্নত হয়েছে। বর্তমান যুগের পরিপ্রেক্ষিতে, এইসব উপন্যাসগুলির ক্ষেত্রে, মানুষের জীবনের নানান দিকের ছবি অত্যন্ত পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ও সুচারুভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। মানুষের জীবনের সাথে ধর্ম ও সমাজ ওতপ্রোতভাবে জড়িত। উপন্যাস মানুষের জীবন কাহিনী।

গবেষণার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

ধর্মের ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে আলোকপাত করলে দেখা যাবে যে মানুষের ভাবনার বিবর্তনের ইতিহাসে ধর্ম অত্যন্ত ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ধর্মের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট শুধুমাত্র ধর্মের ইতিহাস জ্ঞাত হওয়ার উপায় নয়, প্রকৃত ধর্মের চরিত্র ও নীতির বিবর্তন প্রকাশিত হয়ে ওঠে। ধর্মের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাসই সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতে ধর্মকে কখনো গ্রহণযোগ্য আবার কখনো ব্রাত্য করে তোলে। যেকোনো বিষয়ের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট অত্যন্ত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ। উপন্যাস শুধুমাত্র কাহিনী নয়, কাহিনীকে আশ্রয় করে কোন বিশেষ শ্রেণীর বা সম্প্রদায়ের জীবনগাথায় উঠে আসে, সেই সমাজস্থ মানুষের জীবনযাত্রা, আচার-আচরণ, ধর্ম-কর্ম, জীবনসমস্যা, সামাজিকসমস্যা অনেক ক্ষেত্রে তার সমাধান বা সুরাহা। তাই অনেক সময়েই এক একটি উপন্যাস হয়ে ওঠে এক একটি গবেষণাপত্রের সমান। বর্তমান গবেষণায় বিশ্বায়নের পরবর্তী ১৯৯১ থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত লিখিত উপন্যাসগুলিতে যে সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় দ্বন্দ্ব-সংকট প্রদর্শিত হচ্ছে, তার নিরিখে পাওয়া সত্য তথ্যগুলি এক আধুনিক ধর্মীয় সমাজ বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে সহায়কের ভূমিকা পালন করেছে।

সাহিত্য পর্যালোচনা

সাহিত্য মাত্রই জাতির গৌরব ও গর্বের প্রতীক। বাংলা উপন্যাসও সমাজের অতীত, ভাব-চিন্তা, কর্ম, জ্ঞান, মনীষা, আচরণ এবং সর্বোপরি ধর্মের স্মারক ও সাক্ষ্য। সাহিত্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হ'ল ধর্ম। ধর্মকে কেন্দ্র করেই মানুষের সমাজ জীবনে উঠে আসে নানান সমস্যা। সাহিত্য সমাজদর্পণ ও দর্শন। তাই সমাজদর্পণে প্রতিফলিত মানুষের সমস্ত পরিচয়ের দর্শন তুলে ধরে, সমাজের মানুষের মনে সমাজচেতনা, সমাজবোধ, সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি, আত্মানুসন্ধান এগুলি হয়ে ওঠে ঔপন্যাসিকদের আত্মকথন, যা পাঠকেরও আত্মদর্শন ঘটাতে সমর্থক।

বর্তমান গবেষণার শিরোনাম হ'ল, **'বাংলা উপন্যাসে ধর্মের প্রসঙ্গ : একটি সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ'** অর্থাৎ বর্তমান গবেষণার প্রধান উপপাদ্য হ'ল, বাংলা উপন্যাস, যার ওপর নির্ভর করে বর্তমান গবেষণার মূল্যবান তথ্যাদি সংগ্রহ করা হয়েছে এবং সেই তথ্যনির্ভরতা গবেষণার কাজের অগ্রগতির ক্ষেত্রে অত্যন্ত সহায়কের ভূমিকা পালন করেছে। এই গবেষণার কাজের সাথে বর্তমান গবেষকের অগ্রগামী গুণীজন হিসেবে, বর্তমান গবেষকের পূর্ববর্তী গবেষকদের গবেষণাকাজ, বর্তমান গবেষণাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সহায়কের ভূমিকা গ্রহণ করেছে।

গবেষণার উদ্দেশ্য

প্রথমতঃ ভারতবর্ষে বিশ্বায়নের পরবর্তীকাল অর্থাৎ ১৯৯১ সালের জুলাই মাস থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত বাংলা উপন্যাসে ধর্ম ও সমাজ কতখানি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়রূপে প্রতিপন্ন হয়েছে এবং সমাজ ব্যবস্থায় ধর্মের প্রভাব কিভাবে প্রতিনিয়ত প্রতিফলিত হয় সেইবিষয়ে সম্যকজ্ঞান আহরণ করা।

দ্বিতীয়তঃ বাংলা উপন্যাসের প্রভাব বর্তমান সমাজকে কতখানি সাম্প্রদায়িকতামুক্ত সমাজ করে গড়ে তুলতে পারে সেই বিষয়ে লক্ষ্য দেওয়া।

তৃতীয়তঃ সাধারণ মানুষ ধর্মপুস্তকের পরিবর্তে বিনোদনের মাধ্যম হিসেবে উপন্যাস পাঠের দ্বারা ধর্ম ও সমাজ সম্পর্কে যখন জ্ঞাত হয়, তখন তা পাঠকের মধ্যে নীতিবোধ, মূল্যবোধের জন্ম দিতে সক্ষম হতে পারে। আর এই নীতিবোধ, মূল্যবোধই মানুষের মধ্যে ধর্মবোধের প্রতিচ্ছবি। যা সাম্প্রদায়িকতামুক্ত সমাজ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সদর্থক পদক্ষেপ বলা যেতে পারে। সেই কারণেই ধর্ম পুস্তক (যা কেবলমাত্র একটি বিশেষ বয়ঃক্রমের কাছে

বেশি গ্রাহ্য) – এর পরিবর্তে উপন্যাসকেই বর্তমান গবেষক, এই গবেষণার জন্য মনোনীত করেছেন। ধর্মজ্ঞান আহরণের আর এক মাধ্যম – উপন্যাস পাঠও হতে পারে, এই সত্যানুসন্ধান করার উদ্দেশ্যেই বর্তমান গবেষক এই গবেষণায় ব্রতী হয়েছেন।

গবেষণা পদ্ধতি

এই গবেষণায় মূলত গুণগত পদ্ধতি (কোয়ালিটেটিভ স্টাডি) অনুসরণ করা হয়েছে। বর্তমান গবেষক গবেষণার কাজের সুসংহত অগ্রগতির কারণে যে বিশেষ পদ্ধতিকে সহায়ক হিসেবে গ্রহণ করেছেন, সেই পদ্ধতিটি হ'ল – বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ (Content Analysis) পদ্ধতি। এই গবেষণা মূলত নথিকেন্দ্রিক গবেষণা। তাই এই গবেষণা বিশ্লেষণের পদ্ধতির মধ্যে সবচেয়ে প্রচলিত হলো গুণগত বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ পদ্ধতি (Qualitative Content Analysis)। এই বিশ্লেষণ পদ্ধতি অনুযায়ী, বিশ্লেষণযোগ্য নথির অন্তর্ভুক্ত অন্তর্নিহিত বিষয়বস্তু অনুসন্ধান করে সেগুলিকে বিস্তারিত বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বর্তমান গবেষণাটি উপন্যাস নির্ভর। তাই এই গবেষণায় বর্তমান গবেষক উপন্যাসগুলির প্রতিটি অংশকে বিশ্লেষণ করেছেন।

গবেষণা বিশ্লেষণ

বাংলা সাহিত্যের উপন্যাসে ধর্মের পরিচয় পেতে, বর্তমান গবেষণাকর্মে গৃহীত বিশ্বায়নের পরবর্তী ১৯৯১ থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত সময় পর্বকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। বর্তমান গবেষণায়, গবেষণাকার্যের সুবিধার্থে গবেষণাকালকে সচেতনভাবেই পর্যায়ক্রমে তিনটি পর্বে বিভক্ত করা হয়েছে। তবে এক্ষেত্রে গবেষণাকালকে বিষয়ভিত্তিকগতভাবে বিভক্তিকরণ করা হয়নি, কেবলমাত্র গবেষণাকার্যের সুবিধার্থে, সচেতনভাবেই, গবেষণাকালের নিরিখে, উপন্যাসগুলিকে তিনটি পর্বে বিভক্তিকরণ করা হয়েছে। পর্বগুলি হ'ল যথাক্রমে প্রথম পর্ব (১৯৯১-২০০০), দ্বিতীয় পর্ব (২০০১-২০১০) ও তৃতীয় পর্ব (২০১১-২০১৭)। এবার এই তিনটি পর্বের, প্রতিটি পর্বকে, পাঁচটি অনুশীর্ষ (Sub Heading) – এ বিভক্ত করা হয়েছে। অনুশীর্ষগুলি যথাক্রমে ইতিহাস, রাজনৈতিক দিক, সামাজিক দিক, সমাজে নারীর স্থান ও ধর্মীয় দিক।

মানুষের সাধারণধর্মকে গোষ্ঠী, জাতি ও রাষ্ট্রের সীমাবদ্ধতা ছাড়িয়ে বিশ্বজনীন ধর্মের ধারণায় পরিণত করার ভাবনা থেকেই বিশ্বায়ন পরবর্তী সময়কে বর্তমান গবেষক, সময়ের নিরিখে, উপযুক্ত সময় বলে মনে করেছেন। সকল ধর্মের নির্যাসকে প্রাধান্য দিয়ে বিশ্বধর্মে

রূপান্তরিত করে, বিশ্বের সকল প্রান্তে এক সর্বজনীন ধার্মিক বার্তা উন্মুক্ত করে দেওয়ার কারণে, এই ভাবনার অবতারণা যা সমগ্র বিশ্ববাসীর কাছে, বিশ্বভ্রাতৃত্বের ক্ষেত্রে এক সদর্থক বার্তা হয়ে উঠতে পারে। এই বিশ্বায়নে ধর্মের স্থানও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়রূপে বিবেচ্য হতে পারে।

উপসংহার

ঔপন্যাসিকদের দৃষ্টিভঙ্গিতে গবেষণায় গৃহীত বিশ্বায়নের পরবর্তী সময়কালের (১৯৯১-২০১৭) উপন্যাসপ্রাপ্ত গবেষণার তথ্যানুযায়ী যে বিষয়গুলি গবেষণায় প্রাধান্য পাচ্ছে তা হ'ল – ঔপন্যাসিকদের দৃষ্টিভঙ্গিতে ধর্মভাবনা, আচার সর্বস্ব ধর্ম – ধর্ম নয়, সমাজে ধর্মের নামে দ্বন্দ্ব ও সাম্প্রদায়িকতার প্রভাব, সমাজে ধর্মের নিরিখে নারীর প্রকৃত অবস্থান, প্রকৃত ধর্মবোধ।

ঔপন্যাসিকদের দৃষ্টিভঙ্গিতে ধর্মভাবনা

মানবজীবনের প্রেক্ষাপটে একটি প্রাচীন প্রতিষ্ঠান হিসেবে ধর্মের উপস্থিতি সর্বজনগ্রাহ্য। বিভিন্ন ঔপন্যাসিকেরা নানান উপন্যাস রচনার মাধ্যমে, মানুষের মেধা ও মননে ধর্ম ও সমাজের প্রাসঙ্গিকতা সম্পর্কে, সুসংস্কৃত হতে সহায়কের ভূমিকা পালন করছেন। কারণ মানব জীবনের সাথে ধর্ম ও সমাজ ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বর্তমান গবেষণায় গৃহীত ঔপন্যাসিকদের উপন্যাসে মানুষের মন বা মেধাস্নাত মনন এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে উঠেছে। গবেষণার প্রথম পর্বে ঔপন্যাসিক প্রতিভা বসুর 'সমুদ্র হৃদয়'(১৯৯২), অমরজ্যোতি মুখোপাধ্যায়ের 'শ্রীকৃষ্ণের শেষ প্রহর'(১৯৯৯), দ্বিতীয় পর্বে ঔপন্যাসিক নারায়ণ সান্যালের 'কনকলতার সন্ধানে'(২০০৩), তৃতীয় পর্বে ঔপন্যাসিক কল্পনা রায়ের 'সেই সময় পেরিয়ে'(২০১২), সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের 'সাধের ময়না'(২০১৫) উপন্যাসগুলির বিশ্লেষণে ধর্মের একটি প্রধান উপকরণ হিসেবে মানুষের মন প্রাধান্য পেয়েছে। সমাজের মানুষের ভাষা, ধর্ম, সংস্কৃতি, বিনোদন, সৃজনশীলতা সমস্ত কিছুর প্রকাশই মানুষের মনের দ্বারা সম্পাদিত হয়। তাই সাহিত্যে, সংস্কৃতিতে এবং ধর্মে যে উন্নত মানসিকতার বিপ্লব দেখা দিয়েছে তা সর্বাংশেই মানুষের মন দ্বারা প্রভাবিত ও নির্ধারিত হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে ধর্মে ধর্মে যেমন সাম্প্রদায়িকতা উঠে এসেছে, ঠিক তেমনি ধর্মে ধর্মে সাঙ্কর্য বা মিশ্রনও প্রতিভাত হয়েছে। যার মূলে মানুষের মনের প্রাধান্যই প্রকটিত হচ্ছে। এই সাঙ্কর্য বা ধর্ম মিশ্রণের বিষয়টিই ধর্মকে বিশ্বায়নের পথে অগ্রসর হতে সাহায্য করে থাকে, যার মূলে মানুষের মনই প্রধানত এক সদর্থক কার্যকর ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে। এই কারণে প্রাগৈতিহাসিক কাল

থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত ধর্মের বিবর্তনে মানুষের মন বা মানসিক চেতনার অস্তিত্ব বর্তমান গবেষণায় গৃহীত ঔপন্যাসিকদের উপন্যাসে এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে উঠেছে।

আচার সর্বস্ব ধর্ম, ধর্ম নয়

ধর্ম ও নীতিবোধ একে অন্যের পরিপূরক বা সমার্থক বলা যেতে পারে। যদিও মানুষের নীতিবোধ যুক্তিনির্ভর। কিন্তু ধর্মের প্রেক্ষাপট হ'ল, ভক্তি ও বিশ্বাস। আর নীতিকে যুক্তির তুলাদন্ডে বিচার করা হয়। এই পার্থক্যের মধ্যেই ধর্ম ও নীতিবোধের সম্ভাব্য দ্বন্দ্বের বীজ নিহিত আছে। সমাজে কখনো কখনো নীতিবোধের সাথে সমীচীনতা বজায় রেখে ধর্মের অবস্থান্তর করা হয়। এই অবস্থান্তরে ধর্ম কখনো নীতিবোধকে সমর্থন করে, আবার কখনো কখনো নৈতিকচাপে ধর্মের পরিশোধন হয়। ধর্মের পরিকাঠামোর ওপর দাঁড়িয়েই, বলা যেতে পারে যে, শিক্ষা সংস্কৃতির বিকাশই মানুষের জীবন থেকে অজ্ঞতা, অশিক্ষা ও কুসংস্কারকে বিতাড়িত করতে সক্ষম হতে পারে। প্রথম পর্বের উপন্যাসগুলির মধ্যে ঔপন্যাসিক আনন্দময় বড়ুয়ার 'অন্বেষণ'(১৯৯৪), ঔপন্যাসিক রামকৃষ্ণ সাঁতরার 'ভরা কোটাল'(২০০০), দ্বিতীয় পর্বের উপন্যাসগুলির মধ্যে ঔপন্যাসিক আবুল বাশারের 'আমি লালন কবীর'(২০০৯), ঔপন্যাসিক নজরুল ইসলামের 'ভূমিপুত্র(১)' (২০০২), তৃতীয় পর্বের উপন্যাসগুলির মধ্যে ঔপন্যাসিক মলয়শঙ্কর ভট্টাচার্যের 'অন্তপ্রহর'(২০১১), সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'কমলিকা'(২০১২) বিষয়টি পরিস্ফুট হয়েছে।

এই তিনটি পর্বের লিখিত উপন্যাসগুলির ঔপন্যাসিকরা বিভিন্ন পরিবেশে, বিভিন্ন মানসিকতায়, বিভিন্ন সময়ের আঙ্গিকে উপন্যাসগুলি লেখা সত্বেও, সমাজের সর্বাঙ্গীন কল্যাণের স্বার্থে, ধর্মের নীতিসম্মত নৈতিকবোধের ক্ষেত্রে, একে অন্যের সাথে সহমত পোষণ করেছেন। সমাজের সুস্থ সামাজিক ন্যায়-নীতির ও নিয়ম-শৃঙ্খলার ধারণার মধ্যেই সাম্য, স্বাধীনতা ও সৌভ্রাতৃত্ববোধের সহাবস্থান লক্ষ্য করা যায়। এই বিষয়ে মানুষের সাথে মানুষের ভাষার মধুময়তা এক গুরুত্বপূর্ণ সদর্থক পদক্ষেপ হয়ে উঠতে পারে। কারণ সুমধুর ভাষার ব্যবহারই হ'ল সমস্ত মানবিক মানুষের সুন্দর মনের পরিচয়। তাই সুমধুর ভাষার ব্যবহারকে অসাম্প্রদায়িকতার এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে মান্যতা দেওয়া যেতে পারে। ধর্মের গোঁড়ামি, কুসংস্কার, কু-প্রথা এগুলি বিশ্বভাতৃত্বের অন্তরায় হয়ে উঠতে পারে। বিশ্বায়নের হাত ধরে বলা যেতে পারে যে ন্যায়নীতিবোধরূপ, মানবিকতাবোধসম্পন্ন আন্তর্জাতিক নিয়ম বা আইন মানুষের প্রকৃতিগত আচার-আচরণ ও ন্যায়-নীতিবোধ থেকেই উদ্ভূত হয় যা সারাবিশ্বের সমস্ত রাষ্ট্রের কাছেই অত্যন্ত অভিপ্রেত বিষয়রূপে গণ্য হয়। ধর্মীয়

স্বাধীনতার ক্ষেত্রেও এই বিষয়টি সমানভাবে কার্যকর হলে সাম্প্রদায়িকতার নঙর্থক পরিবেশ থেকে সারা বিশ্বজুড়ে মানব সমাজকে রক্ষা করা সহজসাধ্য হয়ে যেতে পারে।

সমাজে ধর্মের নামে দ্বন্দ্ব ও সাম্প্রদায়িকতার প্রভাব

বর্তমান গবেষণায় গবেষণালব্ধ তথ্য বিশ্লেষণের পরে যে সত্য জানতে পারা যাচ্ছে তা অত্যন্ত বিস্ময়কর। ধর্ম মানুষকে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে উঠে সম্প্রীতি ও সংহতির মানবিক মূল্যবোধের সঙ্গে একাত্ম হতে বা মিলিত হতে সাহায্য করে। সুস্থ সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে ধর্মের ধ্বজা ধরে সাম্প্রদায়িকতার পোষণ, ধর্মের প্রকৃত অর্থের উন্মোচন করে না। ধর্মের নামে রাজনীতি এবং সেই ধর্মীয় রাজনীতির বলি হয় নারী-শিশু ও সাধারণ মানুষ। ধর্মের ভিত্তিতে ভারতবর্ষের তিন টুকরো হয়ে যাওয়া দেশভাগের কষ্ট এখনো ভারতবর্ষ, বাংলাদেশ ও পাকিস্তানে দুই সম্প্রদায়ের মানুষের মননেই, মানুষের এক ভয়াবহ বর্বরতা, মনুষ্যত্বহীনতা ও জাত্যাভিমানের সাম্প্রদায়িকতার অভিজ্ঞতার রেশ জাগিয়ে রেখেছে। ধর্মের কারণে দেশভাগের যন্ত্রণায় শুধুমাত্র মানুষের বিশ্বাস ভেঙেছে তা নয়, দেশভাগের কারণে – দেশ ভেঙেছে, স্বপ্ন ভেঙেছে, আশ্রয় ভেঙেছে। বর্তমান গবেষণায় গৃহীত কিছু কিছু উপন্যাসে সাম্প্রদায়িকতা ও নীতিহীনতার কারণে সম্প্রদায়গত যে বিদ্বেষ ও ঘৃণা সমাজকে রক্তাক্ত ও নিঃশেষ করে চলেছে, তার উপায় হিসেবে বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন ঔপন্যাসিকেরা যে সদর্থক বার্তা দিয়েছেন, তা এককথায় অনবদ্য বলে চিহ্নিত করা যেতে পারে। প্রথম পর্বের উপন্যাসগুলির মধ্যে ঔপন্যাসিক তসলিমা নাসরিনের 'লজ্জা'(১৯৯৩), আবুল বাশারের 'আকাশলীনা'(১৯৯৪), সমরেশ মজুমদারের 'মেয়েরা যেমন হয়'(২০০০) এবং গবেষণার দ্বিতীয় পর্বে ঔপন্যাসিক সিস তাতানের 'ত্রাস'(২০০১), সুহাস ভট্টাচার্যের 'পরবাসে-সহবাসে'(২০০২), সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'বিজনে নিজের সঙ্গে'(২০০২), নারায়ণ সান্যালের 'কনকলতার সন্ধানে'(২০০৩), কিন্নর রায়ের 'তুষিত স্বর্গের আলো'(২০০৫) ও অভিজিৎ সেনের 'সবুজ শ্যাওলা ঢাকা জল'(২০০৮) উপন্যাসগুলিতে, উপন্যাসপ্রাপ্ত প্রয়োজনীয় তথ্যাবলী বিশ্লেষণের মাধ্যমে যে সত্য প্রাপ্ত হওয়া গেল তা হ'ল, তিনটি পর্বেই – ঔপন্যাসিকেরা নীতিহীনতাকেই প্রকৃত ধর্মবোধের পরিপন্থী বলে মনে করেছেন। জাতিভেদ, ধর্মবৈষম্য এবং ধর্মান্ধতাই সাম্প্রদায়িকতার জন্মদাতা। মানুষের দ্বারা মানুষকে একত্রীকরণের প্রক্রিয়া ধর্ম, আবার মানুষের দ্বারাই মানুষকে বিভক্তিকরণের প্রক্রিয়া সাম্প্রদায়িকতা। গবেষণার প্রতিটি পর্বেই ঔপন্যাসিকদের প্রতিবাদী কণ্ঠ বারবার এই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাকে সমাজের সকল স্তরের, সকল সম্প্রদায় নির্বিশেষে, সকল মানুষের কাছে অত্যন্ত অনভিপ্রেত বিষয় বলেই চিহ্নিত করেছেন। তবুও এই সাম্প্রদায়িকতায় ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় মানুষকে অংশগ্রহণ করতে হয়। যখন কুসংস্কারমুক্ত, শিক্ষিত, বিজ্ঞানমনস্ক,

মানসিক সচেতনতাকে, মানুষ সাধারন মানুষের মধ্যে ধর্মের বিকল্প ব্যবস্থার সদর্থক ধারণা হিসেবে, মানবিক মূল্যবোধকে জাগ্রত করতে সক্ষম হবে, তখন সমগ্র মানুষের সামগ্রিকভাবে, শ্রেণীগত ও রাজনৈতিক অবস্থান সম্পর্কে এক সুস্থ ধারনার সৃষ্টি হওয়া হয়তো সম্ভব হতে পারবে যা সাম্প্রদায়িকতামুক্ত সুস্থ সমাজের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং অভিপ্রেত এ কথা বলা যেতেই পারে।

সমাজে ধর্মের নিরিখে নারীর প্রকৃত অবস্থান

উপন্যাসের তথ্যানুযায়ী, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ আর ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ হ'ল, সমাজের নারী সম্প্রদায়ের এক অন্ধকারময় যুগ। এই যুগের ইতিহাসে যে সমাজের পরিচয় পাওয়া যায়, তাতে নারী সমাজের জীবনীশক্তি প্রায় অন্তর্হিত হয়ে গিয়েছিল। এই বিষয়ে গবেষণা বিশ্লেষণের প্রথম পর্বের উপন্যাসগুলির মধ্যে ঔপন্যাসিক নারায়ণ সান্যালের 'মান মানে কচু'(১৯৯২), নারায়ণ সান্যালের 'হিন্দু না ওরা মুসলিম' উপন্যাসের 'সন্তান মোর মার'(১৯৯৫), আফসার আমেদের 'বিবির মিথ্যা তালাক ও তালাকের বিবি এবং হলুদ পাখির কিসসা'(১৯৯৫), নিমাই ভট্টাচার্যের 'রুদ্রাণী'(১৯৯৫), আশাপূর্ণা দেবী 'প্রেম ও প্রয়োজন'(১৯৯৫) দ্বিতীয় পর্বের উপন্যাসগুলির মধ্যে ঔপন্যাসিক সুস্মিতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'এক বর্ণও মিথ্যা নয়'(২০০১), নজরুল ইসলামের 'ভূমিপুত্র (১)' (২০১০, তৃতীয় মুদ্রণ), নারায়ণ সান্যালের 'কনকলতার সন্ধানে'(২০০৩), সমরেশ মজুমদারের 'জীবনটাকে চেখে দেখুন'(২০০৭), গৌতম রায়ের 'বিষকণ্ঠী সুলোচনা'(২০০৭)। তৃতীয় পর্বের উপন্যাসগুলির মধ্যে ঔপন্যাসিক অভিজিৎ সেনের 'মৌসুমীর সমুদ্রের উপকূল'(২০১২), হাসান আজিজুল হকের 'সাবিত্রী উপাখ্যান'(২০১৪), তাপস রায়ের 'পোড়া মাটির দেউল'(২০১৬) প্রভৃতি উপন্যাসগুলি উল্লেখযোগ্য।

এই তিন পর্বের উপন্যাসগুলিতে সমাজে নারীর প্রকৃত স্থান তুলে ধরা হয়েছে। এই উপন্যাসগুলির তথ্যানুসারে যে গবেষনালব্ধ বিষয়টি প্রাপ্ত হওয়া গেছে, তা হ'ল, বিভিন্ন উপন্যাসের কাহিনী অবলম্বনে অতীতের ধর্মালোচনায়, ধর্মের নামে নারী ও শিশু শোষণ অত্যন্ত হৃদয়বিদারক ভাবে তুলে ধরা হয়েছে। নারী শোষণের নামে বলা যেতে পারে অশিক্ষা, কৌলিন্য রক্ষার্থে বিবাহ, সহমরণ বা সতীদাহ প্রথা, বিধবাদের নারকীয় জীবনযাত্রা যেমন বেনারস ও বৃন্দাবনের বিধবা আশ্রম, পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের দেবদাসী প্রথা, নারী শিক্ষায় অনুৎসাহ ইত্যাদি। মুসলিম নারীদের ক্ষেত্রে তালাক প্রথা, স্বামীর বহুবিবাহ ও তালাকপ্রাপ্তা রমণীর অসন্মানজনক বহুবিবাহ, অশিক্ষা, পরাধীনতা, এছাড়াও নারীর প্রতি অন্যায় অবিচার। শিশু শোষণের ক্ষেত্রে বলা যেতে পারে অতীতের বাল্যবিবাহ প্রথা, পিতা-

মাতার পুণ্য অর্জনের জন্য গৌরিদান প্রথা, বাল্যবিধবাদের নারকীয় জীবনযাত্রা ইত্যাদি। অতীতের নারী শোষণের নামে সমাজের কু-প্রথাগুলির অস্তিত্ব বর্তমানে না থাকলেও আজও ধর্মের নামে নারী শোষণ সমাজে সমানভাবে প্রবহমান। বর্তমানে নববিধান তৈরি করে, হিন্দু মহিলাদের পুরুষদের সঙ্গে সমান অধিকার বলবৎ করার প্রচেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু মুসলমান সমাজে ধর্মের নামে নারীর অসম্মানের বিষয়টি আজও অনেক ক্ষেত্রেই সমানভাবে বর্তমান। কারণ মুসলমান সমাজে নারীসম্মানের পক্ষে কোন নববিধান তৈরি হয়নি। এছাড়াও পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্মগুলির ক্ষেত্রেও বর্তমান গবেষণায় গৃহীত উপন্যাসগুলির মধ্যে নারীর অসম্মানের দিকটি অত্যন্ত ভয়াবহ রূপে প্রকট হয়ে উঠেছে। এ থেকে একটি বিষয় অত্যন্ত পরিষ্কার যে কোন ধর্মীয় সমাজের ক্ষেত্রেই নারীর সম্মানের দিকটি সেভাবে প্রাধান্য পায়নি। উপন্যাসের তথ্যানুযায়ী এর জন্য শুধুমাত্র পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থাই যে দায়ী, সেকথা বোধহয় সর্বৈব সত্য নয়। কারণ নারীদের এই অসম্মানের বিষয়টি নারীরা নিজেরাই ধর্মের নামে অনেক ক্ষেত্রেই স্বাভাবিক বলেই মনে করে থাকেন বা মেনে নিয়ে থাকেন। তাই ধর্ম শুধুমাত্র কল্যাণময় কোন আশীর্বাদ, তা নয়। বরং ধর্ম অনেক ক্ষেত্রেই অভিশাপের মতো মানুষের জীবনে কার্যকর হয়ে চলেছে।

প্রকৃত ধর্মবোধ

মানব সভ্যতার মর্মে ধর্ম অবস্থিত। সেই কারণে মানুষের মননের ধর্মবোধ ব্যর্থ হলে মানব সভ্যতা বিপন্ন হতে পারে এ কথা বলা যেতেই পারে। মানব সভ্যতার বিকাশের অগ্রগতির শর্ত হ'ল মানুষের বিশ্বাস, অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান – এই ভাবনায় ভাবিত হওয়া যেতে পারে। জ্ঞান মানুষের সংস্কৃতি বা কৃষ্টির ও সভ্যতার মধ্যে সমন্বয় করতে সদর্থক ভূমিকা নিতে পারে। সমাজ, সংস্কৃতি, আদর্শ, উপলব্ধি, এসবই সাধারণ মানুষের ধর্মভাবনাকে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করে। সঠিক সংস্কৃতি বা কৃষ্টির আভিজাত্যকে অনুশীলন বা অভ্যাসের দ্বারা মানুষকে আয়ত্ব করতে হয়। সভ্যতা, ধর্ম ও সংস্কৃতির শাস্ত্রীয় ভিত্তি যা মানুষের মননের গভীরে প্রবেশ করে, এক সর্বজনীন ও বিশ্বজনীন শক্তির ভিত্তি প্রস্তুত করে, যার শক্তিতে বলা যেতে পারে – "যতো ধর্মস্ততো জয়ঃ।" অর্থাৎ সত্য মানবিক ধর্মই, মানুষের মানবিকতার জয়ের অস্তিত্ব ঘোষণা করে থাকে। প্রথম পর্বের উপন্যাসগুলির মধ্যে ঔপন্যাসিক ডঃ দীপক চন্দ্রের 'উপেক্ষিতা শূর্পণখা'(১৯৯৪), দ্বিতীয় পর্বের উপন্যাসগুলির মধ্যে ঔপন্যাসিক বুদ্ধদেব গুহের 'পর্ণমোচী'(২০০৪), অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'জনগণ(২য় পর্ব)' (২০০৫), গৌতম রায়ের 'বিষকণ্ঠী সুলোচনা'(২০০৯), তৃতীয় পর্বের উপন্যাসগুলির মধ্যে ইন্দু সাহার 'গোপনপুরের উপকথা'(২০১১), স্বপ্নময় চক্রবর্তীর 'দুনিয়াদারি'(২০১৫), রমাপদ চৌধুরীর 'লালবাঈ'(২০১৫), রঞ্জন বন্দোপাধ্যায়ের 'প্রাণসখা বিবেকানন্দ(৩)'(২০১৫)

উপন্যাসগুলিতে ঔপন্যাসিকদের মহামূল্যবান উপন্যাসপ্রাপ্ত তথ্য দ্বারা, বিশ্বায়নের পরবর্তী সময়ের ধর্মের সত্যানুসন্ধান, নীতিবোধ ও মূল্যবোধের মাধ্যমে, মানুষের মধ্যে প্রকৃত ধর্মরূপ মানবিকতা বা মনুষ্যত্বকে প্রতিষ্ঠা করতে ঔপন্যাসিকেরা সচেষ্ট হয়েছেন। তাই সমাজে একমাত্র ধর্ম – মানবিকতা বা মনুষ্যত্ব। যা সাম্প্রদায়িকতা দূর করে, মানুষ মানুষে ভাতৃত্বভাব প্রকাশিত করার চাবিকাঠি। এভাবে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ঔপন্যাসিকেরা কলম কণ্ঠের দ্বারা উপন্যাস সৃষ্টির মাধ্যমে সুস্থ ও সুষ্ঠু সমাজ ব্যবস্থা ও প্রকৃত ধর্ম – 'মনুষ্যত্ব'-এর প্রচার নীরবে করে চলেছেন।

প্রতিটি জীবের প্রাথমিক চাহিদা হ'ল নিরাপত্তা। ধর্মীয় মতবাদানুযায়ী মানুষ নশ্বরতাজনিত নিরাপত্তাহীনতার শিকার। মানবকল্যাণ বা জীবকল্যাণ সবই নিরাপত্তার অন্বেষণ। কাজেই জীবকে নিরাপত্তা প্রদান ধর্মের আর এক রূপ। তাই মানুষ সৃষ্ট ঈশ্বর ও ঈশ্বরসৃষ্ট জীব পরস্পর নিরপেক্ষভাবে একে অন্যের নিরাপত্তার কারণ। এখানে কোনো জাত-বর্ণ বা ধর্মের বিভেদ ক্রিয়াশীল হতে পারে না। তাই সমদর্শীর সমন্বয়ই ধর্মের মূল বিষয়। প্রতিটি মানুষকে শুধু মনুষ্যত্বের হাত ধরে, সেই সর্বধর্মসমন্বয়ের পথে, আত্মিক উপলব্ধিকে পাথেয় করে, এগিয়ে যেতে হবে নতুন এক ধর্ম গড়ার আকাঙ্ক্ষায়, যার নাম – মনুষ্যত্ব।

ধর্মের উৎপত্তি মূলত দ্বন্দ্ব থেকে। যেকোনো ধর্মে 'দ্বন্দ্ব' – ই নতুন ধর্মের স্রষ্টা। সমগ্র পৃথিবীতেই এক ধর্মের অধঃপতন আরেক ধর্মের আমন্ত্রক। এমনকি একই ধর্মের মধ্যেও দ্বন্দ্ব থেকেই সৃষ্টি হয় একাধিক সম্প্রদায়ের। বিশ্বায়নের সেই ধর্মীয় প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে দেখা যায় যে – এই ধর্মীয় বিভাজনরেখাটা, উপরোক্ত অসাম্প্রদায়িকতার পথে না গিয়ে বরং একটা বিরাট ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক উন্মাদনার সৃষ্টি করছে, যা বিশ্বজনীন ধর্ম গড়ে তুলে এক বিশ্বভ্রাতৃত্বের বার্তা দেওয়ার ক্ষেত্রে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াচ্ছে। যতই সমাজ অগ্রসর হোক না কেন, মানুষ যতই সর্বধর্মসমন্বয়ের কথা বলুক না কেন, সমাজের বুদ্ধিজীবীরা ও সাধারন মানুষেরা সকলে একসাথেই, মানবধর্মের প্রসঙ্গকে প্রাধান্য দেওয়া সত্ত্বেও, কোথাও যেন একটা সূক্ষ্ম মানসিক বিভাজনরেখা সুতোর মতো সমাজের মানুষের মাঝখানে অবস্থান করছে, সেই কারণেই বিশ্বায়নের পরবর্তী কালের যুগেও পারস্পারিক বিভেদের অভিযোগটা অনেকক্ষেত্রেই এখনও মারাত্মক আকার ধারণ করছে। যদিও ধার্মিকতা মানুষের অস্তিত্বের শিকড় যা মানুষকে ধারণ করে। মানুষকে ধর্মের ধারণার, ধারণা প্রদান করে। জীবন জড়ানো থাক ধর্মের ধারণার চিরন্তন সত্য অন্বেষণে। মঙ্গল হোক সমৃদ্ধ প্রকাশের, জয় হোক জীবনের প্রতিটি ক্ষণের।

গবেষণার সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

বর্তমান গবেষণার শিরোনাম হ'ল – **'বাংলা উপন্যাসে ধর্ম : একটি সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ'**। সামাজিক বাস্তব অবস্থাকে বুঝতে হলে তা মানুষের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই বোঝা সম্ভব হতে পারে। কারন সমাজের যেকোনো পরিস্থিতি বর্তমান গবেষকের দৃষ্টিগোচর হওয়ার পূর্বেই, কোন না কোনভাবে উপরোক্ত পরিস্থিতির সঙ্গে যুক্ত সম্মানীয় ব্যক্তিত্বদের অভিজ্ঞতায় তা প্রতিফলিত হয়ে থাকে। তাই সম্মানীয় সমাজবিজ্ঞানী ও দার্শনিকদের ধর্ম সম্পর্কে মতামতের সাথে, গবেষণায় গৃহীত বিভিন্ন ঔপন্যাসিকদের উপন্যাসপ্রাপ্ত ধর্ম সম্পর্কে মতামত যেভাবে দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে, তা সামাজিক পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ধর্মকে বিশ্লেষণ করে, তার যথার্থ ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা হয়েছে।

এই বিষয়ে বর্তমান গবেষক ফরাসি সমাজতত্ত্ববিদ দুর্খাইম, সমাজতত্ত্ববিদ কার্ল মার্কস, সমাজবিজ্ঞানী কান্ট, অস্তিত্ববাদী দার্শনিক টিলিশ, সমাজতত্ত্ববিদ হারবার্ট স্পেনসারের সাথে যথাক্রমে ঔপন্যাসিক প্রদীপ চট্টোপাধ্যায়ের 'কথা' (২০০৬), ঔপন্যাসিক স্বপ্নময় চক্রবর্তীর 'একলা চলো রে' (২০১৬), ঔপন্যাসিক গৌরকিশোর ঘোষের লেখা 'প্রেম নেই' (২০১৬), ঔপন্যাসিক সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের 'অনলপ্রভ বিদ্যাসাগর' (২০০৫) এবং ঔপন্যাসিক আবুল বাশারের 'ধর্মের গ্রহণ' (১৯৯২) উপন্যাসগুলির সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করেছেন যা গবেষণাটিকে সঠিক মার্গদর্শণে সহায়কের ভূমিকা পালন করেছে।

তাই ঔপন্যাসিকদের মতামত বিভিন্ন উপন্যাসগুলিতে কখনো কখনো এক হয়ে যাচ্ছে আবার কখনও কখনও তাঁদের মধ্যে মতবিরোধও পাওয়া যাচ্ছে। সর্বদা হয়ত তাঁদের এই মানসিকতা, তাঁরা নিজেরাও সমর্থন করেন না। তবু জাতীয় স্বার্থের কথা স্মরণে রেখে, উপন্যাসগুলিকে শুধুমাত্র নিজধর্মের আঙ্গীকে নয়, সমগ্র বিশ্বমানবিকতার ঐক্য রক্ষার ভাবনায়, ধর্মবোধকে পুষ্ট করার চেষ্টা করেছেন, যা বিশ্বায়নের সদর্থকতাকেই দৃশ্য করে তুলেছে। তাই এই ছাব্বিশ বছরের বাংলা উপন্যাসগুলিতে, ঔপন্যাসিকরা ধর্মের প্রসঙ্গ কিভাবে পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন এবং ধর্মের সদর্থকতা ও নঙর্থকতাগুলিকে মানুষের মূল্যবোধের আয়নায় কিভাবে দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রতিফলিত করার চেষ্টা করেছেন তাই বর্তমান গবেষকের কাছে বিচার্য বিষয়। কারণ মানুষের মনন বিশ্বব্যাপী শান্তিপূর্ণ সহযোগিতার নীতিকে গ্রহণ করার এক সদর্থক পদক্ষেপ।

গ্রন্থপঞ্জি

আমেদ, আফসার, (জানুয়ারী, ১৯৯৫), ‘‘বিবির মিথ্যা তালাক ও তালাকের বিবি এবং হলুদ পাখির কিসসা’’, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃঃ ১১, ১২, ৩৯, ৪৬, ৪৭, ৬৪ – ৬৬, ৮০, ৮৪, ৮৭, ISBN: 81 - 7079 - 644 – X

ইসলাম, নজরুল, (অক্টোবর ২০০২), ‘‘ভূমিপুত্র (১)’’, ভাষা ও সাহিত্য, কলকাতা, পৃঃ ৩৬ – ৪০, ৬৬, ৬৭, ৭০ – ৭২, ISBN: 81- 86581 – 55 – 3

গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল, (১৪০৮), ‘‘বিজনে নিজের সঙ্গে’’, শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকা, এবিপি প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, পৃঃ ৩৪৪, ৩৪৫

_____, (জানুয়ারী ২০১২), ‘‘কমলিকা’’, অঞ্জলি প্রকাশনী, কলকাতা, পৃঃ ৮১ -৮৩, ৮৬ - ৯০, ৯৪ - ৯৬, ১০১ - ১০৩, ISBN: 978 – 81- 922567 - 7-1

গুহ, বুদ্ধদেব, (জুলাই, ২০০৪), ‘‘পর্ণমোচী’’, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃঃ ৭৯, ৮০, ISBN: 81 - 7612 - 737 – X

ঘোষ, গৌরকিশোর, (জুন, ২০১৬), ‘‘প্রেম নেই’’, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, পৃঃ ৩৮, ২৪৭, ISBN: 978 - 81 - 7066 - 324 – 9

চক্রবর্তী, স্বপ্নময়, (১৪২৩), ‘‘একলা চলো রে’’, শারদীয় সংবাদ প্রতিদিন, প্রতিদিন প্রকাশনী প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, পৃঃ ১২৬, ১২৭, ১২৮

_____, (১৪২২), ‘‘দুনিয়াদারি’’, শারদীয়া সংবাদ প্রতিদিন, প্রতিদিন প্রকাশনী প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, পৃঃ ৮৮, ৯৬, ১০১, ১০৭

চট্টোপাধ্যায়, প্রদীপ, (এপ্রিল, ২০০৬), ‘‘কথা’’, প্রতিভাস, কলকাতা, পৃঃ ২৬, ২৭, ৪৩, ৪৭ - ৪৯, ১৩৩ – ১৩৭

চট্টোপাধ্যায়, সঞ্জীব, (ফেব্রুয়ারি, ২০১৫), ‘‘সাধের ময়না’’, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, পৃঃ ২৫ - ২৮, ৭২, ISBN: 81 - 7215 - 310 – 4

_____, (জানুয়ারী ২০০৫), ‘‘অনলপ্রভ বিদ্যাসাগর’’, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃঃ ৫৪, ৭০, ISBN: 81 - 295- 0342 – 5

চন্দ্র, ডঃ দীপক, (১৫ই এপ্রিল, ১৯৯৪), "উপেক্ষিতা শূর্পনখা", দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃঃ ৪৩, ৬১, ISBN: 81 - 7079 - 593 – 1

চৌধুরী, রমাপদ (২০১৫), "লালবাঈ", আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, পৃঃ ৪৪,৪৫, ১৮৬, ISBN: 978 - 81- 7215 - 690 – 9

তাতান, সিস (৬ই ডিসেম্বর, ২০০১), "ত্রাস", উবুদশ, কলকাতা, পৃঃ ২৬, ২৭, ১৩১, ISBN: 81 - 87487 – 13

দেবী, আশাপূর্ণা, (নভেম্বর, ১৯৯৫), "প্রেম ও প্রয়োজন", গ্রন্থতীর্থ, কলকাতা, পৃঃ ৫৩, ৬৩, ৮০, ISBN: 81 - 7332 - 116 – 0

নাসরিন, তসলিমা, (ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৩) "লজ্জা", পার্ল পাবলিকেশন্স, বাংলাবাজার, ঢাকা, পৃঃ ৯, ১০, ১২, ১৯, ২১, ২৫, ২৬, ৩০, ৪০, ৭০

বসু, প্রতিভা, (নভেম্বর, ১৯৯২), "সমুদ্রহৃদয়", দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃঃ ৫২ - ৫৫, ৭৫, ৮২, ISBN: 81 - 7079 - 216 -9

বড়ুয়া, আনন্দময়, (৬ ই পৌষ, ১৪০১), "অন্বেষণ", অনামিকা পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃঃ ৬ - ৮, ১৮৯ – ১৯১

বন্দ্যোপাধ্যায়, অতীন, (ডিসেম্বর, ২০০৫), "জনগন (২য় পর্ব)",করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, পৃঃ ১০৮, ১০৯, ১৪৪

বন্দ্যোপাধ্যায়, রঞ্জন, (ডিসেম্বর, ২০১৫), "প্রাণসখা বিবেকানন্দ (তৃতীয় খন্ড), পত্রভারতী, কলকাতা, পৃঃ ৮৭, ৮৮, ১২০, ১২২, ISBN: 978 - 81 - 8374 -372- 3

বন্দ্যোপাধ্যায়, সুস্মিতা, (জানুয়ারি, ২০০১), "এক বর্ণও মিথ্যা নয়", ভাষা ও সাহিত্য, কলকাতা, পৃঃ ৪৩,৫৪, ৫৫, ৮৬, ১২৩-১২৮, ISBN: 81 - 86581 - 54- 5

বাশার, আবুল, (১৪১৫), "আমি লালন কবীর", শারদীয় আজকাল, আজকাল পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, পৃঃ ৩৫৭, ৩৫৯, ৩৮৩

_____, (জানুয়ারি ১৯৯৪), "আকাশলীনা", আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, পৃঃ ১৯ - ২১, ৭০ - ৭২, ৯১, ISBN: 81-7215 - 327 -9

_____, (জানুয়ারি ১৯৯২), "ধর্মের গ্রহণ", আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, পৃঃ ৬১, ১১৯, ১২০, ১২১, ISBN: 81 - 7215 - 068 – 7

ভট্টাচার্য, নিমাই, (১৯৯৫), "রুদ্রাণী", সাহিত্যম, কলকাতা, পৃঃ ১৬ - ২০, ISBN: 81 - 7267 - 034 – 6

ভট্টাচার্য, মলয়শঙ্কর, (সেপ্টেম্বর, ২০১১), "অন্তপ্রহর", বাংলার মুখ প্রকাশন, কলকাতা, পৃঃ ৪১, ১৯৩, ২০৫, ২০৬, ISBN: 978 - 81 - 921186 - 4 – 2

ভট্টাচার্য, সুহাস, (১লা জানুয়ারী, ২০০২), "পরবাসে-সহবাসে, (দ্বিতীয়-সংস্করণ)", সহজ কথা ও সমাচার, নসীবপুর, হুগলী, পৃঃ ১৫, ১৬

মজুমদার, সমরেশ, (ফাল্গুন, ১৪০৬), "মেয়েরা যেমন হয়", মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, পৃঃ ৩৭, ৪১, ISBN: 81 - 7293 - 538 – 2

মুখোপাধ্যায়, অমরজ্যোতি, (১৯৯৯), "শ্রীকৃষ্ণের শেষ প্রহর", বিজয়ন প্রকাশনী, কলিকাতা, পৃঃ ৩৫, ৪৫, ৪৬, ৬৫, ৬৬, ১২০, ১৫৭

রায়, কল্পনা, (এপ্রিল, ২০১২), "সেই সময় পেরিয়ে", প্রয়াগ প্রকাশনী, কলকাতা, পৃঃ ১৪, ১৫, ৩০, ISBN: 81 - 89820 - 42 – 8

রায়, কিন্নর, (অক্টোবর, ২০০৫), "তুষিত স্বর্গের আলো", দে'জ পাবলিশিং, কলিকাতা, পৃঃ ১২, ১৩, ১৪, ৬০, ৬৩, ৬৬ – ৬৮

রায়, গৌতম, (নভেম্বর, ২০০৭), "বিষকণ্ঠী সুলোচনা", নাথ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃঃ ৭, ৮, ১৮, ISBN: 81 - 8093 - 097 – 1

রায়, তাপস, (জানুয়ারি, ২০১৬), "পোড়ামাটির দেউল", আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, পৃঃ ৩০, ১৩৪, ১৩৫, ১৩৭, ISBN: 978 - 93 - 5040 - 592 - 5

সাহা, ইন্দু, (ডিসেম্বর, ২০১১), "গোপনপুরের উপকথা", অক্ষর প্রকাশনী, কলকাতা, পৃঃ ১২, ২০৩, ২০৪, ISBN: 81 - 88186 - 01 – 5

সাঁতরা, রামকৃষ্ণ, (নভেম্বর, ২০০০), "ভরাকোটাল", প্রকাশক-মুজিবর রহমান, কলকাতা, পৃঃ ৬৫ – ৬৭

সেন, অভিজিত, (১৪১৫), ‘‘সবুজ শ্যাওলা ঢাকা জল’’, শারদীয় আজকাল, আজকাল পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, পৃঃ ১৭২

_____, (জানুয়ারি, ২০১২), ‘‘মৌসুমি সমুদ্রের উপকূল’’, প্রতিভাস, কলকাতা, পৃঃ ২৯, ৩০, ৩৭, ৪৮, ৪৯, ১৩৫, ১৩৬

সান্যাল, নারায়ণ, (জানুয়ারি, ১৯৯২), ‘‘মান মানে কচু’’, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃঃ ২২, ২৩

_____, (জানুয়ারি ২০০৩), ‘‘কনকলতার সন্ধানে’’, দেব সাহিত্য কুটীর প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, পৃঃ ৩৩, ৩৪, ৫০, ৫৩, ৬৯, ৭৬, ৭৭

_____, (নভেম্বর, ১৯৯৫), ‘‘সন্তান মোর মার’’, ‘‘হিন্দু না ওরা মুসলিম’, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃঃ ৭০ - ৭২, ISBN: 81 - 7079 - 774 – 8

হক, হাসান আজিজুল, (জানুয়ারি, ২০১৪), ‘‘সাবিত্রী উপাখ্যান’’, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃঃ ১৭২, ১৭৩, ISBN: 978 – 81 - 295 - 2149 - 1

Supervisor
Dated: 12.01.2022

Candidate
Dated: 12.01.2022